Vol. 7 | No. 1 | 1963

Check for updates


# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd


## মধুমালতীর কাহিনী



| | |
|---|---|
| Volume | 7 |
| Issue | 1 |
| Year | 1963 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | মমতাজুর রহমান তরফদার |
| Published online | June 15, 1963 |
| DOI | 10.62328/sp.v7i1.4 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v7i1.4 |
| Pages | 103-132 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# মধুমালতীর কাহিনী

**মমতাজুর রহমান তরফদার**

ভক্তিবাদের মতো সুফী মতবাদও একটি সৃজনধর্মী দর্শন। ভক্তি আন্দোলনের প্রবল বন্যায় ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন হয়েছে উর্বর—গড়ে উঠেছে সখী, দোহা, পদাবলী, জীবনী-কাব্য-নাটক ও রস-শাস্ত্রের এক বিশাল সাহিত্য জগত। ইরানের সাহিত্যও সুফী-দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। সানায়ী, ফরিদউদ্দীন আত্তার, জলালউদ্দীন রুমী, নিযামী ও জামীর মরমী কবিতাগুলি বাদ দিলে ফারসী কাব্যজগত যে একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে. সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই কবি-গোষ্ঠির মধ্যে কেউ কেউ কয়েকটি বিখ্যাত প্রেম-কাহিনীকে রূপকের ছাঁচে ঢেলে নিয়ে তাদের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক প্রেমের জয়গানে মুখর হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ নিযামীর 'হফ্‌ত্‌ পয়কর' এবং জামীর 'ইউসুফ জোলায়খা' ও 'লায়লা মজনু' প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যেতে পারে। মানবীয় প্রেম ও এ্যাড্‌ভেন্চার এই রূপক কাব্যগুলির বহিরঙ্গ; কিন্তু সুফী প্রেমসাধনার পরিণতি রূপে মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনই এদের অন্তর্নিহিত ভাব-সম্পদ।

মধ্যযুগের ইরানী সাহিত্য নগর-কেন্দ্রিক বিদগ্ধ মানসের সৃষ্টি বলে এর গণ্ডীর মধ্যে কোনো লোক-কাহিনীর অস্তিত্ব নেই। ফারসী কাব্যে তাই কোনো লোকগাথাকে সুফী মতবাদের চিত্রকল্পরূপে ব্যবহার করার প্রশ্নও ওঠে নি। ভারতের মরমী দর্শন ইরানের অবদান-প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ হলেও একটি ব্যাপারে এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম লক্ষণীয়—এদেশের সুফী কবিগণ প্রচলিত লৌকিক গল্পগুলিকেই মিস্‌টিক্ ভাবধারার আধার রূপে গ্রহণ করেছেন। সেকালের প্রায় প্রত্যেকটি অবধী কাহিনীকাব্যই সুফী রূপকল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একথা অজানা নয় যে কুতবন ও মালিক মুহম্মদ

জায়সী যথাক্রমে সুহ্‌রাওয়ার্দী ও চিশতী সম্প্রদাভুক্ত। দুজনেরই কাব্যে রয়েছে উভয় ত্বরিকার গুরু পরম্পরার সশ্রদ্ধ উল্লেখ। গণ-জীবনের সঙ্গে সুফী ধ্যান-ধারণার সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যেই যে তাঁরা আঞ্চলিক ভাষাকে এবং জনপ্রিয় লোক-গাথাগুলিকে মরমিয়া তত্ত্বের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করেছেন, সে কথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। অনুরূপ কারণে দাকিনী উর্দু‌কে আশ্রয় করে দাক্ষিণাত্যে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, তা শিয়া ভাবধারায় সম্পৃক্ত।

সূফী সাধকদের এই মানসিক প্রবণতা সেকালের রাজনৈতিক আবহাওয়ার মাঝে শক্তি সঞ্চয় করেছে বলে মনে হয়। তুর্ক-আফগান শাসকগণ, হয়ত বা মধ্য এশিয়ার মঙ্গলদের আচরণের কথা স্মরণ করে, এদেশেই স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ইরানীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত, বহিরাগত এই মুসলমানগণ তাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন না। মওলানা দাউদের 'চান্‌দায়েন্‌,' সাধনের 'মৈনা সত,' কুতবনের 'মৃগাবত,' জায়সীর 'পত্নমাবত' ও মীর মন্‌ঝনের 'মধুমালত' এই ধরণের রাজনৈতিক পরিবেশে রচিত। ফারসী রূপক কাহিনী-গুলি গণ-মানসের সৃষ্টি নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি অবধী কাহিনীর জড় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে বিহার ও উত্তর প্রদেশে প্রচলিত লোকগাথার রাজ্যে। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, পনের শতকের মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে ষোল শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই একশ বছর ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। শুধু অবধ এলাকায় নয়, বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজ্যগুলিতেও এই সময় সাহিত্য, স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় সমৃদ্ধির সূত্রপাত। সারা ভারতব্যাপী মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসের ফলে তাই একটি বিশেষ সম্ভাবনার বুকে দীর্ঘকালের জন্য ছেদ পড়লো।

## দুই

'পত্নমাবত' কাব্যের তেইশ সর্গে সে কালের যে কয়েকটি সুপরিচিত লৌকিক প্রেম-গাথার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে,[২] মনোহর-মধুমালতী তাদের মধ্যে

অন্যতম। অবধের সূফী কবি মীর মন্‌ঝন্ এই কাহিনীকে কাব্যিক রূপ দিয়েছিলেন ষোল শতকের গোড়ার দিকে।[২] গল্পটির সারাংশ এই ঃ

কনেসরের রাজা সূর্যভানের পুত্র কুমার মনোহর। একরাত্রে অপ্সরাগণ নিদ্রিত কুমারকে নিয়ে গেল মহারস নগরের রাজপ্রাসাদে যেখানে রাজকুমারী মধুমালতী ঘুমাচ্ছিলো। ঘুম ভাঙলে উভয়ের মধ্যে হলো ভাব-বিনিময়। আবার যখন তারা ঘুমিয়ে পড়লো, তখন অপ্সরার দল মনোহরকে রেখে গেলো তার পৈতৃক রাজধানীতে। সকালে জেগে উঠে উভয়ই বিস্মিত ও বিরহ কাতর। বিরহী মনোহর চললো হঠাৎ-দেখা সেই রাজকন্যার সন্ধানে। পথে এক মহা সমুদ্র। প্রচণ্ড ঝড়ে লোকজনসহ জাহাজটি বিনষ্ট হলো। কোনোরূপে তার জীবন রক্ষা পেলো। একটি কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে সে এলো কিনারায়। জঙ্গলের মধ্যে সে দেখলো এক সুন্দরী নারী। সে চিৎ-বিস্‌রামপুরের রাজা চিত্রসেনের কন্যা প্রেমা। এক রাক্ষস তাকে সেখানে বন্দী করে রেখেছে। প্রেমা মধুমালতীর প্রিয় বান্ধবী। গৃহত্যাগী রাজপুত্রের বেদনাদায়ক কাহিনী শুনে সে বললো যে মধুমালতীর সঙ্গে তার মিলন সম্ভব। রাক্ষসকে হত্যা করে মনোহর বন্দিনী প্রেমাকে উদ্ধার করলো। তারা চলে এলো চিৎ-বিস্‌রামপুর। কৃতজ্ঞ রাজা চিত্রসেন রাজকুমারের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে আগ্রহশীল। কিন্তু প্রেমার তাতে ঘোরতর আপত্তি। কেননা ইতিমধ্যেই তাদের মাঝে ভাই-বোন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অবিলম্বে এখন মনোহর মধুমালতীর যোগাযোগ দরকার। সংবাদ পেয়ে মাতা রূপ-মঞ্জরীর সঙ্গে মধুমালতী এলো প্রেমার গৃহে। পরদিন সকালে রূপ-মঞ্জরী মধুমালতী ও মনোহরকে চিত্রশালায় একত্র ঘুমাতে দেখলেন। উভয়ের মাঝে আবার বিচ্ছেদ। মধুমালতীর প্রতি মাতার কঠোর নির্দেশ—সে যেন মনোহরকে চিরতরে ভুলে যায়। কিন্তু রাজকন্যার প্রেম একনিষ্ঠ। রূপমঞ্জরীর অভিশাপে সে পাখীতে রূপান্তরিত হলো। সে উড়ে গেলো দেশান্তরে। মায়ের বুকে জেগে রইলো অপরিসীম দুঃখের ভার। পাখী চলে এলো দয়ালু ও দানশীল রাজকুমার তারাচাঁদের দেশে। কুমার তাকে সোনার খাঁচায় ধরে রাখলো। পাখী-রূপিনী মধুমালতীর মুখে তার দুঃখের কাহিনীটি শুনে তারাচাঁদ মনোহরের সঙ্গে তাঁর মিলন সাধনে উদ্যোগী হলো। যখন সে মহারস নগরে এলো, রূপমঞ্জরী পাখীর গায়ে জল ছিঁটিয়ে তাকে পুনরায় মানবীতে পরিণত করলেন। মধুমালতীর মাতাপিতা কন্যাকে তারাচাঁদের হাতে সঁপে দিতে চাইলেন। কিন্তু তাদের বিবাহ অসম্ভব, কারণ তারা ভাই বোন সম্পর্ক পেতেছে। তারাচাঁদ মনোহরের সঙ্গে মধুমালতীর মিলনে যথেষ্ট আগ্রহ দেখালো। রূপমঞ্জরীর সঙ্গে

> সঙ্গে মধুমালতীও প্রেমার কাছে পত্র লিখলো। মধুমালতীর দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে প্রেমা তখন বিলাপে রত। সে শুনতে পেলো যোগীর বেশে মনোহর তার গৃহদ্বারে উপস্থিত। তারাচাঁদ ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মধুমালতীর মাতা-পিতা এলেন চিৎ-বিস্‌রামপুরে। তারপর মনোহরের সঙ্গে মাধুমালতীর বিবাহ। নব-দম্পতি সুখে সময় কাটাচ্ছিলো। একদিন শিকার থেকে ফিরে তারাচাঁদ দেখলো মধুমালতী ও প্রেমা দোলনায় দোল খাচ্ছে। আকস্মিকভাবে প্রেমার প্রতি তার আকর্ষণ অত্যান্ত প্রবল হলো: সে মূর্ছা গেলো।

এখানে পাণ্ডুলিপি খণ্ডিত বলে গল্পটি অসমাপ্ত। কিন্তু মধুমালতী কাহিনীর ফারসী, দাকিনী উর্দু ও বাংলা সংস্করণগুলিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে প্রেমার সঙ্গে তারাচাঁদের বিবাহ হয়েছিলো অবশেষে রাজকুমারদ্বয় আপন আপন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে এসেছিলো।

মন্‌ঝনের 'মধুমালত' মধ্যযুগের অন্যান্য প্রেম কাহিনীর মত বর্ণনাময় ও উদ্দেশ্যমূলক। তবুও এ গল্প একেবারে বৈশিষ্ট্যবিহীন নয়। বিভিন্ন অবধী রোমান্টিক কাব্যে একজন করে উপনায়িকার সাক্ষাৎ মেলে। তার ভাগ্য নায়কের জীবনের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে গ্রথিত। মন্‌ঝন্ কিন্তু এই ট্র্যাডিশন্ অনুসরণ না করে এক উপ-নায়কের চরিত্র সৃষ্টিতে যত্নবান—উদ্দেশ্য উপনায়িকার সঙ্গে তার বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন। তার ফলে একটি চিরাচরিত গাল্পিক cliche অপসারিত হয়েছে আর ঘটেছে প্রধান চরিত্রগুলিতে নিতান্ত মানবীয় সুকুমার প্রবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশ। এই কাব্যে তারাচাঁদ ও প্রেমা পার্শ্ব-চরিত্র হিসাবে তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধুমালতীর প্রতি মনোহরের এবং প্রেমার প্রতি তারাচাঁদের আকর্ষণ লিবিডোশূন্য নয়। কিন্তু মনোহরের সঙ্গে প্রেমার এবং তারাচাঁদের সঙ্গে মধুমালতীর সম্পর্ক অনেকটা আদর্শায়িত হলেও যৌনধর্মের গণ্ডীর বাইরে মানবীয় অনুভূতিশীলতায় সমৃদ্ধ।

মধুমালতের সঙ্গে পদুমাবতের ঘটনাসাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। মনোহরের মহারস যাত্রা রত্নসেনের সিংহল যাত্রার দৃশ্য স্মরণে আনে। উভয় নায়ক পথে বিপদের সম্মুখীন; ঝড় ঝঞ্ঝায় উভয়েরই লোকজন ও জাহাজ বিধ্বস্ত। প্রেমার রূপ দর্শনে যেমন তারাচাঁদ মূর্চ্ছা যায়, দর্পণে পদ্মাবতীর প্রতিবিম্ব দেখেও তেমনি আলাউদ্দিন সংজ্ঞা হারায়। দু'একজন পণ্ডিত ইতিমধ্যেই

এধরণের ইঙ্গিত করেছেন যে ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গির ব্যাপারে মন্ঝনের কাছে জায়সীর ঋণ অসামান্য।[৩]

মন্ঝন্, জায়সী ও কুত্বন্ অবধী কাহিনীকাব্যের মাধ্যমে সুফী প্রেম সাধনার প্রবক্তা। তাঁরা অনুভব করেছেন এক অখণ্ড ও বাস্তব অধ্যাত্ম-জগতের অস্তিত্ব। সে জগত প্রেম, বিরহ, মিলন, নৈরাশ্য ও সাফল্যের পৌনঃপুনিক আন্দোলনে বেগবান। আর সে জগতের বিচিত্র রং রেখায় ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মার রহস্যময় প্রতিফলন! কুতবনের ভাষায়ঃ সৃষ্টির মধ্য দিয়েই স্রষ্টার প্রকাশ। এমনিভাবেই উভয়ের যোগাযোগ। চিত্র দেয় চিত্রকরের সন্ধান। সতর্ক অনুসন্ধানে তাকে লাভ করা সহজ। আত্মার মাঝে পরমাত্মার জ্যোতি বিকীর্ণ। পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ হলে প্রেমধর্মের প্রভাবে মনের সহজ স্থিতিশীলতা জন্মে। কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা, অভিমান ও মায়া এবং শরীর ধারণের পঞ্চোপকরণ যতদিন স্থায়ী, ততদিনই সম্ভব জৈবিক সুখ-সম্ভোগ![৪] পদুমাবতের আখ্যানভাগ ছাড়াও বিভিন্ন কবিতাংশে রয়েছে আধ্যাত্মিক প্রেম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। জায়সী এ কাহিনীর রূপকধর্ম ব্যাখা করেছেন এমনিভাবেঃ চিতোর হচ্ছে মানব-দেহ, রাজা মন, সিংহল হৃদয়, পদ্মিনী বুদ্ধি, শুক পথ-নির্দেশকারী গুরু, নাগমতী এই দুনিয়ার ধান্ধা, রাঘবদূত শয়তান এবং সুলতান আলাউদ্দীন মায়া—প্রেমকথা এইরূপে বিচার্য।[৫] মন্ঝনের কাব্যে এই সূফী ঐতিহ্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। তিনি বলেছেনঃ[৬]

দেখত হী পহিচানেউ তোহী।
এহী রূপ জেহি ছঁদর্‌য়ো মোহী।
এহী রূপ বুত অহৈ ছপানা।
এহী রূপ রব সৃষ্টি সমানা।।
এহী রূপ সকতি ঔ সীউ।
এহী রূপ ত্রিভুবন কর জীউ।।
এহী রূপ প্রগটে বহু ভেসা।
এহী রূপ জগ রংক নরেসা।।

[দেখলেই তাকে চিনতে পারা যায়।
এই রূপই যা বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত।।
এই রূপই মূর্তিতে প্রচ্ছন্ন।

এই রূপই প্রভুর সৃষ্টির সমান।।
এই রূপই শক্তি ও শিব।
এই রূপই ত্রিভুবনের জীবন।।
এই রূপই প্রকটিত হয় বহু বেশে।
এই রূপই জগতের রঙ-রেখা।। ]

এই কবিতাংশে বিধৃত হয়েছে সূফী কবির বিশ্বাত্মবাদ বা Pantheism যা ইরানের মরমী দর্শনের ও ভারতীয় বেদান্তের প্রাণকেন্দ্র। নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলি রহস্যবাদের তাৎপর্যে গভীর ইঙ্গিতময়। মন্‌ঝন্ মানস-কেন্দ্রে উপলব্ধি করেছেন আধ্যাত্মিক বিরহের নিগূঢ় স্পন্দন। সে বিরহের স্রোতধারায় সারা বিশ্ব স্নাত, প্লাবিত। কবির উক্তি তাই উচ্ছ্বসিত ঃ

বিরহ অবধি অবগাহ অপারা :
কোটি মাহি এক পরৈ ত পারা।।
বিরহ কি জগত অঁবিরথা জাহী ?
বিরহ রূপ য়হ সৃষ্টি সবাহী।।
নৈন বিরহ-অংজন জিন সারা।
বিরহ রূপ দরপন সংসারা।।
কোটি মাহি বিরলা জগ কোঈ।
জাহি সরীর বিরহ দুখ হোঈ।।
রতন কি সাগর সাগর হি ?
গজমোতী গজ কোই।
চঁদন কি বন বন উপজৈ,
বিরহ কি তন তন হোই।।
[ বিরহের সীমা নির্ধারণ করা সুকঠিন।
কোটির মধ্যে এক পারে ত পারে।
বিরহ জগত কি বৃথা যাবে ?
সমগ্র সৃষ্টিই বিরহের অভিব্যক্তি।
নয়নে বিরহ অঞ্জন যার সার,
তার কাছে সংসার বিরহ দর্পণ।
কোটির মধ্যে জগতে বিরল কে,
যার শরীরে বিরহ দুঃখ হয়েছে।
রত্ন কি প্রত্যেক সাগরে থাকে।

গন্ধে গজমোতি কোথায়।
চন্দন কি বনে বনে উৎপন্ন হয় ?
বিরহ কি প্রত্যেক শরীরে জন্মে ? ]

কুত্‌বনের মৃগাবত ও জায়সীর পদুমাবতের মতোই মন্‌ঝনের মধুমালত কাব্য যে প্রতীকধর্মী, সে বিষয়ে বিশেষ কোনো সন্দেহ নেই। ইউসুফ-জোলেখা ও লায়লা-মজনুর কাহিনী লিখতে গিয়ে মন্‌ঝনের সমসাময়িক কবি জামী আধ্যাত্মিক প্রেম সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে সব মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন,[৭] উপরোক্ত চরণগুলি পড়ার সময়ে স্বভাবতঃই আমাদের সেগুলি মনে পড়ে যায়। ইরানের কাছে থেকে ভারত সুফী মতবাদকে পেয়েছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সূত্রে। প্রেম-কাহিনীকে আধ্যাত্মিক রূপকের অবলম্বনরূপে ব্যবহারের অনুপ্রেরণাও হয়ত অবধী কবিগণ ইরানের রূপক কাব্য-জগত থেকেই লাভ করেছেন। তবু তাঁরা বিশিষ্ট ; কেননা তাঁরা সমকালীন ভারতের সাংস্কৃতিক ভাষা ফারসী সম্বন্ধে নির্মোহ। ইরানের কবিদের তুলনায় তাঁরা যেন গণ-সংযোগ স্থাপনে অধিকতর প্রয়াসী। আঞ্চলিক ভাষায় ছন্দোবদ্ধ লোকগাথাগুলির কাব্যিক পরিমণ্ডলে তাই নাগরিক সভ্যতার প্রভাব প্রকট নয়।

## তিন

মোগল যুগের হিন্দী সাহিত্যে মুসলিম অবদান অত্যন্ত সীমিত। আকবরের রাজত্বকালে দু'জন মুসলমান হিন্দী কবির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে—তাঁরা হচ্ছেন আলম ও আবদুর রহিম খান-ই-খানান। হিন্দী কাব্য সাধনার মুসলিম ধারাটি ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসছিলো বিশেষ কয়েকটি কারণে। শেরশাহের মৃত্যুর কয়েক বছর পর হুমায়ুনের পারস্য থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন এদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তখন থেকে ভারতের সাহিত্য ও শিল্পে পরিলক্ষিত হয় ইরানী সংস্কৃতির এক নতুন ও সজীব প্রবাহ। আকবরের রাজত্বকালে মোগল সংস্কৃতির উপরে ভারতীয় প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিলো হয়ত বা রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু ইরানীয় প্রভাব ব্যাপকতর রূপ নিয়েছিলো জাহাঙ্গীর, শাজাহান ও আওরঙ্গজেবের আমলে। একথার প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে ইতিমাদুদ্দৌলার সূক্ষ্ম কারুকার্যে, সিকান্দ্রার জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত অংশে, তাজমহল ও ওয়াজির খানের মসজিদের গঠন পদ্ধতিতে ও অলঙ্করণে এবং সমসাময়িককালের

চিত্রকলায়। এ যুগের সাহিত্য ও শিল্পে এই বহির্ভারতীয় প্রভাবের রূপায়ন তাহলে ধারাবাহিক। আকবরের রাজত্বকে ক্রান্তিকাল বলে মনে করলে ইরানীয় ভাবধারার বিকাশ জাহাঙ্গীরের আমলে এবং এর পরিণতি সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। মোগল সম্রাটদের ঘরোয়া ভাষা ছিল তুর্কী এবং ফারসী ছিল দরবারি ও সাংস্কৃতিক ভাষা। প্রাক-মোগল যুগের অবধী কাব্যগুলি এই পরিবেশে পড়ে রীতিমত রূপান্তর গ্রহণ করছিলো। ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ, ইরানীয় ভাবধারায় প্রভাবিত, শিক্ষিত সমাজের মানসিক খোরাক যোগাবার জন্য এই কাহিনী কাব্যগুলি ফারসী কবিতায় ভাষান্তরিত হলো। প্রয়োজনের প্রবল তাগিদ না থাকলে এযুগের কবি-সাহিত্যিকগণ হয়ত বা পদুমাবতের একাধিক ফারসী সংস্করণ[৮] প্রস্তুত করতেন না। দাকিনী উর্দু-সাহিত্যে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে লোর চানদা ও মৃগাবতী জাতীয় প্রেমকাহিনীগুলিও ফারসী গদ্যের বা পদ্যের খোলস পরেছিলো; অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রী ও স্থানের নাম বদলে নিয়ে। মন্‌ঝনের মধুমালতীর ভাগ্যও ঐ একই সূত্রে গাঁথা। মনোহর মধুমালতীর হিন্দী উপাখ্যান অবলম্বনে শেখ নুর মহম্মদ ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে (১০৫৯ হিঃ) একখানি ফারসী মসনবী লিখেছিলেন।[৯] ঐ একই বছরে মন্‌ঝনের মধুমালত অনুসরণে লেখা 'কিস্‌সা-এ মধুমালত ওয়া কুন্‌ওর মনোহর' নামক কোনো এক অজ্ঞাতনামা কবির আরো একখানি রোমান্টিক কাব্য পাওয়া গেছে।[১০] এই দুটি কাব্যের আরম্ভ ও সমাপ্তি প্রায় একই রকমের—উভয়ের উপসংহারে রয়েছে কাব্য রচনার সন তারিখ ও পদ-সংখ্যার উল্লেখ। মনে হয়, এ দুটি শেখ নূর মুহম্মদের কাব্যেরই বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি। অবশ্য পাণ্ডুলিপি দুটির পাঠ-সমালোচনা না করে এ ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে কোনো রায় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। আওরঙ্গজেবের বাল্য-সহচর ও কর্মচারী মীর আসকারী কর্তৃক ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে (১০৬৫ হিঃ) 'মিহ্‌র ওয়া মাহ্‌' নামক একখানি কাব্য রচিত হয়—এটিরও বিষয়বস্তু মনোহর-মধুমালতীর রোমান্‌স্‌। একথা তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে নায়ক-নায়িকার মৌলিক নাম পরিবর্তন করে তিনি 'মিহ্‌র' ও 'মাহ্‌' বা সূর্য ও চন্দ্র রেখেছেন।[১১] সূফীকবি নাসির আলী ছিলেন মোগল আমলের আর একজন রাজকর্মচারী। তাঁর মসনবী-সঙ্কলনের মধ্যে একখানি—মনোহর মধুমালতী কাব্যের প্রথমাংশ—আবিষ্কৃত হয়েছে। চার্লস্‌ রিউ প্রদত্ত উদ্ধৃতিতে দেখা যায় যে কোনো এক শেখ্‌ জুম্মনের কাব্য ছিলো নাসির

আলীর অবলম্বন।[১২] রিউ'র মতামতের ভিত্তিতে Ethe এবং আধুনিক যুগের অনেক পণ্ডিতই শেখ্ জুম্মন নামক এক স্বতন্ত্র হিন্দী কবির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু ফারসী লিপিতে লিপিকরের হাতে 'মন্ঝন্' 'জুম্মনে' পরিণত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। দুটি শব্দই প্রায় একই অক্ষর-সমষ্টিতে গঠিত। নাসির আলীর যে চরণটিতে জুম্মনের উল্লেখ রয়েছে, সেটি পূর্বোক্ত অজ্ঞাতনামা কবির 'কিস্‌সা-এ-মধুমালত ওয়া কুন্‌ওর মনোহর' কাব্য থেকে প্রায় অবিকল ধার করা ; শুধুমাত্র পার্থক্য এই যে অজ্ঞাতনামা কবি যেখানে 'শেখ্ মন্ঝন্' শব্দদুটি বসিয়েছেন, নাসির আলীর কাব্যে ঠিক সেই জায়গায় 'শেখ্ জুম্মন' পাওয়া যাচ্ছে।[১৩] এতে করে প্রমাণিত হয় যে উভয়ক্ষেত্রে কাহিনীটি শেখ্ মনঝনের অবধী কাব্য থেকে আগত। নাসির আলীর মৃত্যু হয় ১১০৮ হিজরীতে অর্থাৎ খৃষ্টীয় সতেরো শতকের শেষ দশকে। আর অজ্ঞাতনামা কবির কাব্যের রচনাকাল ১০৫৯ হিজরী বা ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ। উভয়ে ছিলেন মোগল রাজকর্মচারী। অতএব একথা মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে লেখা কাব্যখানি নাসির আলীর দেখার সুযোগ হয়েছিলো। ফারসী গদ্যেও মধুমালতীর গল্প স্থান পেয়েছে। গুজরাটের মাধোদাস ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে (১০৯৮হিঃ) এই গল্প লিপিবদ্ধ করেন 'মীকা ওয়া মনোহর' নাম দিয়ে।[১৪] এই উপাখ্যানের আরো একটি গদ্য সংস্করণের পাণ্ডুলিপি আছে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে—লেখকের নাম অজানা।[১৫]

এমনি করেই অবধী-হিন্দী সাহিত্যের মুসলিম ধারাটি অবরুদ্ধ হল এবং ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ অংশ ইরানী পোষাক পরলো। অবধী-কাহিনীকাব্য রচনার মূলে ছিলো লোকসংস্কৃতির অনুপ্রেরণা। ছন্দোবদ্ধ এই গল্পগুলি যে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের সহজ সরল প্রাণে আনন্দ যোগাত, সে কথা অনায়াসেই বুঝতে পারা যায়। মধ্যযুগের বাংলার লোককাব্যের মতোই এই কাব্য-গাথাগুলি অসংখ্য গায়কের কণ্ঠে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করত। আকবরের সমসাময়িক কালেও মওলানা দাউদ রচিত চান্দায়েনের অসাধারণ জনপ্রিয়তা অনেকটা এই কাব্যের গীতি-বৈশিষ্ট্যের জন্য। সুর-সংযোগ এবং তবলা সঙ্গত করে পদুমাবতের কাহিনী যে সঙ্গীত রূপে পরিবেশিত হত, সে কথা মালিক মুহম্মদ জায়সী নিজেই স্পষ্ট ভাবে বলেছেন। কিন্তু এই গল্পগুলি যখন অবধী থেকে ফারসী সাহিত্যে চলে এলো, তখন তাদের সাংস্কৃতিক পটভূমিরও

রূপান্তর ঘটেছে। ফারসী কাব্যগুলির রচয়িতা, পাঠক ও শ্রোতা, কেউই আর গ্রামীন সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নন—তাঁরা সবাই ফারসী ভাষায় শিক্ষিত সমাজের লোক। কাব্যগুলিতে শিক্ষিত কবির বিদগ্ধ মানসিকতা ও শহুরে রুচির ছাপ পড়েছে। এগুলি পড়তে গিয়ে মনে হয় যেন আমরা এক নতুন জগতে প্রবেশ করেছি। সে জগতে অপ্সরার সন্ধান মেলে না, কিন্তু পরীরা ঘনঘন আনাগোনা করছে। আর তাদেরই খেয়াল-খুশি অনুযায়ী নায়ক-নায়িকার গতিবিধি ও বিরহ-মিলন নিয়ন্ত্রিত। ভারতীয় নায়কের ভাগ্য-গণনায় ব্যবহৃত হচ্ছে এ্যাস্‌ট্রোলেব্‌ নামক বিদেশী যন্ত্র। কবির মনের দিগন্ত এক পরিশীলিত কল্পনার আলোকে সমুজ্জ্বল! তাঁর ভাষায় তাই প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন যেন চন্দ্র-সূর্যের মিলন কিংবা জোহরা ও মুশতারী নামক তারকাদ্বয়ের পারস্পারিক আলিঙ্গন। বিশুদ্ধ ভারতীয় শব্দ পছন্দ-সই নয় বলে মীর আসকারী পদ্মাবতী ও মনোহর মধুমালত কাব্যদুটির নাম রেখেছেন যথাক্রমে 'শমা 'ওয়া পরওয়ানা' (প্রদীপ ও পতঙ্গ) এবং 'মিহর ওয়া মাহ্‌' (সূর্য ও চন্দ্র)—রূপক হিসেবে এই ফারসী শব্দগুলি হয়ত ইঙ্গিতময়, হয়ত বা ঐতিহ্য-নির্দেশক। তাঁর কাব্যে যেমন অপ্সরার স্থান পরীরা দখল করেছে, সিংহল দ্বীপের মন্দিরে তেমনি আবার তোতার মুখে সয়ফুলমুল্‌কের কাহিনীও ফুটেছে। এমনি করে ফারসী কবিতা অবধী লোক-গাথার জগত থেকে বহুদূরে সরে এসেছে—এ দু'য়ের মধ্যে দুটি বিভিন্ন যুগের ব্যবধান। সতেরো আঠারো শতকে অবশ্য অবধী রোমান্সের ফারসী অনুবাদ থেকে কয়েকটি কাহিনী উত্তর ভারতের ও দাক্ষিণাত্যের উর্দু সাহিত্যে চলে এসেছে। যদিও হিন্দী ও উর্দুর মাঝে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের কাল পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো সীমারেখা টানা হয় নি, তবুও উর্দু সাহিত্যের সমগ্র আবহটি ইরানীয় বলে পূর্বোক্ত উর্দু গল্পগুলির সঙ্গে প্রাক-মোগল যুগের অবধী প্রেম-গাথার বিশেষ কোনো একাত্ম-বোধ জন্মে নি। তবে ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে অনূদিত ফারসী ও উর্দু কাহিনী-গোষ্ঠি এক্ষেত্রে অবধী প্রেম-গাথারই উত্তর পুরুষ।

অজ্ঞাত-নামা কবির ফারসী কাব্যে ধৃত গল্পটি এখানে দেওয়া গেল ঃ[১৬]

কন্‌কর শহরের রাজা সুরযভান অত্যন্ত খ্যাতি-সম্পন্ন। তাঁর রানী কমলা অপূর্ব সুন্দরী। রাজ-দম্পতির পুত্র ছিল না বলে প্রায়ই তাঁরা সন্তান কামনা করতেন। বহুদিন পর তাঁদের এক পুত্র হলো। সৌন্দর্যে সে অতুলনীয়।

নব-জাতকের অদৃষ্ট-গণনার জন্য জ্যোতিবিদদের ভীড় জমলো। তার নাম রাখা হলো কুমার মনোহর। সে সূর্যের চেয়েও দীপ্তিময়। ভাগ্য-গণনার ফলে জানা গেল যে পনেরো বছর বয়সে সে এক জ্বালাময়ী কামনার তাগিদে যোগীর বেশে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াবে। এক বছর সেই অবস্থায় অতিক্রান্ত হলে সে গৃহে ফিরে এসে সাফল্যের সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করবে।

মাতাপিতা কুমারকে যত্নের সঙ্গে লালন-পালন করতে লাগলেন। পাঁচ বছর বয়সে তার বিদ্যারম্ভ। রাজকুমারের লেখাপড়া শেষ হলে রাণীর পরামর্শ-অনুযায়ী রাজা তার হাতে রাজ্যভার সঁপে দিলেন। সে তিন বছর শাসন-কার্য চালিয়ে গেলো। কুমারের বয়স তখন পনেরো বছর। একরাত্রে সঙ্গীত-সভা বসলো। রাজা সুরযভান ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত। মাঝরাতে সভা ভাঙলো। নিজস্ব মহলে ফিরে এসে মনোহর বালাখানায় আরাম করছিলো। সেখানে পরীদের আবির্ভাব। নিদ্রামগ্ন কুমারকে তারা নিয়ে গেলো মহারস নগরের রাজপ্রাসাদে, মধুমালতীর পাশে। তারপর উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ ও যথারীতি প্রেমালাপ। আবার তারা ঘুমে অচেতন হলো। পরীগণ মনোহরকে তার রাজপ্রাসাদে রেখে গেলো। পরদিন নিদ্রা ভাঙলে তার দুঃখ ও বিস্ময়ের অবধি রইল না। যোগীর বেশ ধারণ করে সে স্বপ্নে দেখা নায়িকার সন্ধানে শুরু করল এক দীর্ঘস্থায়ী নিরুদ্দেশ যাত্রা। সঙ্গে চললো প্রচুর ধন-সম্পদ ও বিরাট সেনাবাহিনী। পেছনে পড়ে রইলো অশ্রুবর্ষণরত বহু প্রিয়জন। এবার মনোহর চললো মহারস নগরের উদ্দেশ্যে। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তারা এলো এক নদী-কিনারায়। তারা নৌকার সাহায্যে নদী পার হচ্ছিল। এমনি সময় প্রতিকূল বায়ু বইতে লাগলো। ... নৌকাগুলি তরঙ্গের মাঝে পড়ে গেলো এবং সৈন্যগণ নিপতিত হলো ঘূর্ণির আবর্তে। ভাসমান মনোহর কেবলমাত্র খোদার নাম স্মরণ করলো। হঠাৎ সে ঢেউয়ের মধ্যে দেখতে পেলো এক মজবুত কাষ্ঠখণ্ড। কিছুক্ষণ পর ভগ্ন দেহমন নিয়ে সে তীরে পৌঁছালো বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত কেউ তার সেখানে ছিল না। সে স্থানটি জনমানবহীন। ... মধুমালতীর সঙ্গে তার বিবাহ হলো। গৃহকাতর কুমারদ্বয় রায় চিত্রসেনের নিকট স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করলো। তিনি সমুচিৎ জাঁকজমকের সঙ্গে উভয় রাজকুমারকে বিদায় দিলেন।

মীর আসকারীর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি জটিলতর ও ঈষৎ দার্শনিকতাপূর্ণ।[১৭] পূর্বোক্ত ফারসী কাব্যের সঙ্গে তাঁর 'মিহ্‌র ওয়া মাহ্‌' কাব্যের কাহিনীগত বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট। এখানে মনোহরের পৈতৃক রাজ্য হিন্দুস্তান—রাজার নাম ধীরস। রাজ-মন্ত্রী

সুরযভান। ন্যায়বিচারের জন্য রাজার অত্যন্ত সুনাম। সে রাজ্যের প্রজাগণ সুখী। রাজপুত্র মনোহর সৌন্দর্যে অতুলনীয়। মীর আসকারী যেন তাঁর পাঠকদের সুবিধার জন্য মনোহর নামটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে এটি হিন্দী শব্দ—এর অর্থ ফারসীতে 'দিলবর'। একমাত্র পুত্র বলে রাজা কখনো তাকে দৃষ্টি-সীমার বাইরে রাখতেন না। মনোহরের ভাগ্যগণনা-সংক্রান্ত বর্ণনা এ কাব্যে দীর্ঘায়িত ও জীবন্ত: গণকদের মধ্যে কেউ পাঁজি-পুথি আলোচনায় রত; কেউ নক্ষত্রের হিসাব-নিকাশে বা কুমারের নামের অক্ষর গণনায় ব্যস্ত; কেউ আবার এ্যাসট্রোলেব্ যন্ত্রের সাহায্যে তার জন্মক্ষণ-বিচারে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত। বিচিত্রভাবে কুমারের অদৃষ্টলিপি পাঠ করে তারা তার ঠিকুজী কুষ্ঠি রচনা করলো। গণকদের অভিমত—রাজকুমার ভাগ্যবান, কিন্তু চোদ্দ বছর বয়সে তার ভাগ্য-বিড়ম্বনা সুনিশ্চিত। সেই বছরের নবম মাসে যোগীরূপে সে হবে ভ্রাম্যমান। অবশ্য তার পরিণাম মঙ্গলময়। পাঁচ বছর বয়সে তার হাতে খড়ি। দশ বছর বয়সে সে চন্দ্রের মতো সুন্দর রূপ ধারণ করলো। চোদ্দ বছর বয়সে তার দিনগুলো এক অনাবিল আনন্দের মধ্য দিয়ে কেটে যাচ্ছিলো। বাকি অংশ-টুকু পূর্বোক্ত ফারসী কাহিনীর অনুরূপ। তবে মধুমালতীর সন্ধানে কুমারের মহারস-যাত্রা বর্ণনাবহুল। অর্থাৎ পতাকা-সজ্জিত হস্তী-যূথ, সৈন্য-সামন্ত, আসবাব-পত্র, রসদ, সবকিছুই কবি উল্লেখ করেছেন নিপুণতার সঙ্গে। নৌকাডুবির প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, ভালবাসার সমুদ্রে ঝড়ের তরঙ্গ উঠলে প্রেমিকদের দুর্দশার সীমা থাকে না। কথাগুলো হয়ত সূফী প্রেমের ইঙ্গিতবহ। 'মিহর ওয়া মাহ' কাব্যে মাঝে মাঝে সুন্দর উপমার প্রয়োগ আছে। কাষ্ঠখণ্ডের বুকে ভাসমান মনোহরকে দেখে কবির মনে হচ্ছে যে সে যেন ঝিনুকের মধ্যে অবস্থিত এক টুকরা মুক্তা। প্রেমিক যেন বিকালের ভাস্বর সূর্য। প্রেমিকার সঙ্গে তার মিলন চন্দ্র-সূর্যের মিলন, যা দেখে জোহরা-মুশ্‌তারীর সংযোগ ঘটে। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের মাঝে যখন মনোহরের স্বগৃহের কথা মনে পড়লো, তখন সে বিক্রম রায়ের অনুমতিক্রমে সস্ত্রীক দেশে ফিরে এলো।

## চার

আলাউদ্দীন খিলজীর দাক্ষিণাত্য অভিযান সে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে কোনো রেখাপাত করেছিলো কিনা, বলা কঠিন। কিন্তু মুহম্মদ বিন তুগলক

কর্তৃক দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী অপসারণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যার সঙ্গে দাকিনী উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি বিশেষভাবে জড়িত। সচরাচর একথা মনে করা হয় যে, উত্তর ভারত থেকে আনীত কথোপকথনের ভাষাই কালক্রমে দাক্ষিণাত্যে কথ্য ও সাহিত্যিক ভাষার রূপ গ্রহণ করে। এই দুই অঞ্চলের মধ্যে আর একটি যোগসূত্র হচ্ছে সূফী মতবাদ। বাহ্‌মনী আমলের প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক ও কবি খাজা বান্দা নওয়াজ গেসুদ্দরাজ (মৃত্যু: ৮৬৫ হিঃ বা ৪৬০ খৃষ্টাব্দ) খাজা নাসিরুদ্দীন চেরাগ-ই-দেহলীর শিষ্য ও খলিফা। তাঁর লেখা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভাবধারায় সঞ্জীবিত। তাঁর পুত্র সৈয়দ মুহম্মদ আকবর হুসেয়নী ও পৌত্র সৈয়দ আবদুল্লাহ হুসেয়নী এই সাহিত্যিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারী। এযুগের আর একজন দাকিনী কবি সদরউদ্দীন (মৃত্যু: ৮৭৬ হিঃ বা ১৪৭১ খৃষ্টাব্দ) বেদার উদ্দীন চিশতীর মুরীদ ও খলিফা।[১৮] মোগলদের দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের ফলে উত্তর ভারতের সঙ্গে এদেশের যোগাযোগ দৃঢ়তর হয়েছিলো। এমনিতর পরিবেশে অবধী প্রেমগাথাগুলি ফারসী কাব্যের আকারে দক্ষিণে গিয়ে পৌঁছায় এবং দাকিনী উর্দু সাহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে স্থানলাভ করে। গোলকুণ্ডার সুলতান আব্দুল্লাহ কুতব শাহের সভাকবি গাওয়াসী কোনো এক ফারসী কাহিনী অনুসরণে চানদা-লোরকের মসনবী লেখেন ১৬২৫ খৃষ্টাব্দের (১০৩৫ হিঃ) পূর্বে। 'কেস্‌সা-এ-মৈনা' নামক আর একটি মস্‌নবীর দুটি পাণ্ডুলিপি আছে ইণ্ডিয়া অফিসে। কবি বলেছেন যে গল্পটি ফারসী থেকে গৃহীত। আরো আশ্চর্যের কথা এই যে গাওয়াসীর কাব্যের প্রথমাংশের সঙ্গে এই অজ্ঞাতনামা কবির মসনবীটির প্রথমদিকের প্রায় আক্ষরিক মিল লক্ষ্য করা যায়।[১৯] কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই দুই কাব্যে কাহিনীটি বিভিন্নমুখী হয়েছে। গাওয়াসীর মসনবী মোটামুটিভাবে লোর-চান্‌দার রোমান্‌স্‌-কেন্দ্রিক। আর 'কেস্‌সা-এ-মৈনা' অনেকটা নীতিমূলক— সতী নারী মৈনার ঐকান্তিক স্বামীভক্তি এ কাব্যের মূল বিষয়। দু'এক স্থানে চান্‌দার সঙ্গে লোরকের পলায়নের ইঙ্গিত আছে। সেদিক দিয়ে এগুলোর মিল সাধনের মৈনাসতের সঙ্গে আর গাওয়াসীর কাহিনী মওলানা দাউদের চান্‌দায়েন উপাখ্যান স্মরণ করিয়ে দেয়। গোলাম আলী পদুমাবতের কাহিনী নিয়ে একখানি কাব্য লিখেন ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে (১০৯১ হিঃ) কুতব শাহী সুলতান আবুল হুসেন তানা শাহের রাজত্বকালে। প্রায় পঞ্চাশ

ষাট বছর পর ওয়ালী ঐ কাহিনীকে কেন্দ্র করে আরো একখানি কাব্য রচনা করেন।[২০] কোনো এক ফারসী গদ্য-গ্রন্থের ভিত্তিতে ফয়েজ কর্তৃক ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে (১০৯৪ হিঃ) লেখা 'রিজওয়ান শাহ্ ওয়া রুহে আফজা' কাব্য এবং মুহম্মদ বাকেরের মসনবী 'গুলজার-এ-ইশ্‌ক' (রচনাকাল ১৭৯? খৃষ্টাব্দ বা ১২১০ হিঃ)[২১] বিখ্যাত অবধী কাহিনী মৃগাবতের অনুসরণ। এক্ষেত্রে শুধু এইটুকু পার্থক্য লক্ষণীয় যে মৃগাবতের পটভূমি ভারতীয় এবং দাকিনী কাব্য দুটিতে নায়ক চীনের রাজপুত্র এবং নায়িকা এক মায়াবিনী পরী—সে মৃগাবতীর মতোই ইচ্ছানুযায়ী অন্তর্হিত হতে পারে। এইরূপে দেখা যায় যে, দাকিনী কবিগণ মূল অবধী কাব্যগুলির সংস্পর্শে আসেন নি—তাঁরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নির্ভর করেছেন ফারসী অনুবাদ কাব্যগুলির উপর।

মধুমালতীর গল্পও দাক্ষিণাত্যে জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়। নুসরতীর 'গুলশান-এ-ইশ্‌ক্' কাব্যে এ গল্প বিধৃত। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে হিন্দী ও ফারসী থেকে এই উপাখ্যান সংগৃহীত।[২২] হিন্দী ও ফারসী সংস্করণের সঙ্গে সাদৃশ্য-বহুল হলেও মধুমালতীর এই দাকিনী রূপ অনেকাংশে পরিবর্তিত ও পল্লবিত। এ কাব্যে মনোহরের পিতা বিক্রম ও রাজধানী কনকগির। গল্পের প্রথম দিকে একটি ফকীরের ভূমিকা বেশ প্রলম্বিত, যদিও হিন্দী, ফারসী ও বাংলা সংস্করণে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বিক্রম রাজা অপুত্রক বলে তাঁর গৃহে এই ফকীর খাদ্য-গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছিলো। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাজা রাণীর হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে ফকীরের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। একটি সরোবরের নিকটবর্তী হয়ে তিনি দেখলেন স্নানরতা কয়েকটি পরী। তারপর ছদ্মবেশী রাজা কর্তৃক তাদের বস্ত্রহরণের পালা। স্নানশেষে তারা পরিধান বস্ত্র খুঁজতে লাগলো। রাজা তাদের নিকট স্বীয় দুঃখের কথা জানালেন। তাঁর হাতে কেশগুচ্ছ দিয়ে তারা বললো যে ঐগুলির সঙ্গে অগ্নি সংযোগ করলেই তারা এসে হাজির হবে তাঁর সাহায্যের জন্য। ওরা তাঁকে ফকীরের কাছে নিয়ে গেলো। তাঁকে একটি ফুল উপহার দিয়ে ফকীর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে ফুলটি খেলে রাণী পুত্রবতী হবেন। যথারীতি পরীদের সাহায্যে রাজা তাঁর রাজধানীতে ফিরলেন। ন মাস পরে রাণীর সন্তান জন্মালো। গণকদের ডাক পড়লো। তার নাম রাখা হলো মনোহর। তারপর তার ভবিষ্যত গণনা।—চোদ্দ বছর বয়সে রাজকুমারের বিপদ ঘটবে। রাজবৈদ্যগণ জানালো

যে তার প্রেমের রোগ হবে—সে রোগের কোন প্রতিকার নেই। তাকে এমনি এক স্থানে রাখা উচিৎ যাতে আকাশ তার দৃষ্টিপথে না পড়ে। একটি গুপ্ত গৃহে চললো তার বিদ্যাচর্চা। কিন্তু অদৃষ্টের গতি কে রোধ করতে পারে! এক জ্যোৎস্না-রাতে সে ছাদে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। তারপর পরীবালাদের মাধ্যমে মনোহরের মহারস নগরের রাজপ্রাসাদে আগমন এবং মধুমালতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও অঙ্গুরীয় বিনিময়। উভয়ের আবার বিচ্ছেদ এবং মনোহর কর্তৃক মহারস নগরের উদ্দেশ্যে লোকজনসহ দুঃসাহসিক অভিযান। বিরাট এক সর্পের আক্রমণে তার জাহাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ ও লোকজন নিহত। কুমার গিয়ে পেঁছালো কিনারায়। এক বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে সে পথের সন্ধান পেলো। একটি সুন্দর বাগানে সজ্জিত এক গৃহ। ভিতরে কাঞ্চন-নগরের রাজা সূরয-মল-কন্যা চম্পাবতী বন্দিনী। সে মধুমালতীর বান্ধবী। দেওকে হত্যা করে মনোহর চম্পাবতীকে বাঁচালো। তারা হাজির হলো কাঞ্চন-নগর। রাজা মনোহরের যথেষ্ট আদর-যত্ন করলেন। চম্পাবতীর মা খবর দিয়ে মধু-মালতীকে সেখানে নিয়ে এলেন। তারপর মনোহর-মধুমালতীর পুনর্মিলন। পরপর কয়েক জন সহচরী পাঠিয়েও যখন মধুমালতীকে ফিরিয়ে আনা গেল না, তখন তার মা রূপমঞ্জরী স্বয়ং দেখা দিলেন কাঞ্চন-নগরে। একদিন চিত্র-শালায় এসে তিনি একেবারে স্তম্ভিত। কেননা মনোহর-মধুমালতী সেখানে প্রেমালাপে রত। মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে তিনি কন্যাকে পাখীতে পরিণত করলেন। পাখী উড়ে গিয়ে ধরা দিলো রাজপুত্র চন্দ্রসেনের পিঞ্জরে। পাখীর মুখে আদ্যোপান্ত সব কথা শুনে সে মহারস নগর রওনা হলো। এখানে মধুমালতীর পুনরায় মানবী বেশ ধারণ। মনোহরের খোঁজে চন্দ্রসেন কাঞ্চন-নগর গেলো। তাকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরে এলো মহারস নগর। সেখানে প্রেমিক-প্রেমিকার বিবাহ। চন্দ্রসেনের সঙ্গে তারা আবার হাজির হলো কাঞ্চন নগরে। চম্পাবতীর রূপ-লাবণ্যে চন্দ্রসেন মুগ্ধ—সে প্রেমের পরিণতি ঘটলো উভয়ের বিবাহে। তারপর দম্পতি-যুগলের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

গল্পটি যে হিন্দী ও ফারসী থেকে আগত, সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। মন্ঝনের 'মধুমালত' কাব্যের সঙ্গে নুস্রতীর পরিচয় ছিলো বলে মনে হয়। কিন্তু কোন্ ফারসী কাব্য তিনি ব্যবহার করেছেন, সে কথা স্পষ্টভাবে বলেন নি। অজ্ঞাতনামা কবির বা মীর আসকারীর কাব্যের সঙ্গে গুলশান-

এ-ইশ্‌কের তুলনামূলক সমালোচনাও এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ হবে না, কেননা নুসরতীর অনুবাদ মূলানুগ নয়। আমাদের ধারণা, তিনি মীর আসকারীর লেখা কাব্যখানি পড়েন নি অজ্ঞাতনামা কবির মস্‌নবীই তাঁর অন্যতম অবলম্বন। এই অনুমান নির্ভর করছে সামান্য কয়েকটি প্রমাণের উপর। মন্‌ঝনের কাব্যে মনোহরের পৈতৃক রাজধানী কনেসর: 'কিস্‌সা এ-মধুমালত ওয়া কুন্‌ওর মনোহর' কাব্যে কন্‌কর এবং 'গুলশান-এ-ইশক'-এ কনকগির। অথচ 'মিহর ওয়া মাহ্‌' কাব্যে রাজধানীর নাম নেই, দেশের নাম হিন্দুস্তান। নুসরতী 'কন্‌কর' শব্দটিকে 'কনকগীর'-এ রূপান্তরিত করেছেন। এমনও হতে পারে যে অজ্ঞাতনামা কবির কাব্যের যে পাণ্ডুলিপিটি তিনি দেখেছিলেন, তাতে কন্‌গির ছিলো—কেননা 'গাফ' 'কাফ' এ-পরিণত হতে বিশেষ সময় লাগে না। বাঙ্গালী কবি মুহম্মদ কবীর এই শব্দটিকে একই কারণে কঙ্গিরা পড়ে থাকবেন। নুসরতীর কাব্যে এমন দু' এক চরণ পাওয়া যাচ্ছে যার সঙ্গে উক্ত ফারসী কাব্যের চরণবিশেষের আশ্চর্য রকমের মিল।[২৩] তাছাড়া 'গুল্‌শান-এ-ইশ্‌ক' লেখা হয় ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বা ১০৬৮ হিজরীতে এবং 'মিহর ওয়া মাহ্‌' কাব্যের রচনাকাল ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দ। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই কাব্য উত্তর-ভারত থেকে সুদূর দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়েছিলো কিনা, কে জানে। তবে নুসরতী কাহিনীটিকে ইচ্ছামত পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করেছেন। পূর্বোক্ত ফকীরের ভূমিকা, সরোবরে পরীদের স্নান ও রাজা কর্তৃক তাদের বস্ত্রহরণ—যার সঙ্গে তুলনীয় 'মৃগাবত' কাব্যের রাজকুমার কর্তৃক অপ্সরাদের বস্ত্র-হরণ—সমুদ্রে সর্পের আক্রমণে জাহাজ ধ্বংস ইত্যাদি ঘটনাগুলি ফারসী বা হিন্দী গল্পে নেই—এগুলি নুসরতীর স্বকল্পিত উপকরণ।

## পাঁচ

সমসাময়িক কালের হিন্দু কবিগণ হিন্দী ভাষায় এই কাহিনী কাব্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলেছিলেন। সতেরো শতকের কবি চতুর্ভুজ-দাস মধুমালতী কাব্য লেখেন খুব সম্ভব মন্‌ঝনের মধুমালতের অনুকরণে। কিন্তু দু'জনের মধ্যে কোনো তুলনার প্রশ্ন উঠে না। চতুর্ভুজ দাসের সাধ ছিল রোমান্টিক কাব্য রচনার, কিন্তু সাধ্য ছিল না। প্রকাশ-ভঙ্গির নীরসতা, ছন্দের ত্রুটী-বিচ্যুতি,

ভাষার আভিজাত্য-হীনতা ও কবিত্বশক্তির দুর্বলতা তাঁর লেখাকে নিম্নতর পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণের বলে এই ধারণা জন্মে যে তিনি রাজপুতনার লোক—তাঁর কাব্যে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ একেবারে কম নয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে আট শতকে রচিত ভবভূতির 'মালতী মাধব' নাটকের গল্পের সঙ্গে এ কাহিনীর সাদৃশ্য আছে।[২৪] এই প্রাচীন ট্র্যাডিশনের সঙ্গে চতুর্ভুজ দাসের 'মধুমালতী' কাব্যের সম্পর্ক যাই হোক না কেন, অবধের সাহিত্যিক প্রভাব তাঁর উপরে অত্যন্ত প্রবল। তাঁর কাব্যের মধ্যে 'মৈনা সত' আখ্যায়িকার সন্নিবেশ ঘটেছে একটি উপ-কাহিনীরূপে।[২৫] চতুর্ভুজ দাস-রচিত মধুমালতীর একটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপির পরিচয় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। একটি চিত্রে মধু ও মালতী এক রহস্যময় পরিবেশে আলাপ-রত। অপর দুটিতে নায়ক পড়াশুনার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে রাম সরোবর-তীরে হংস-শিকারে ব্যস্ত; সখীগণের সঙ্গে মালতী জল নিতে আসে—কিন্তু মধুকে সেখানে দেখে অনুরাগ-বিহ্বলা, উৎকণ্ঠিতা নায়িকা মাটিতে বসে পড়ে; তার কাঁখের কলসীটিও ধূলায় অবলুণ্ঠিত। সরোবরে ফুটেছে বেশ কয়েকটি পদ্মফুল। সচরাচর এই ধরণের রোমান্সগুলিতে নায়ক-নায়িকার প্রেমাভিসার শুরু হয় প্রথমে রাম-সরোবর-তীরে, পরে পাঠশালায়। বোস্টনের মিউজিয়ম অব্ ফাইন্ আর্টস-এর সংগ্রহে আর একটি হিন্দী মধুমালতী কাব্যের একটি চিত্রিত পাতা সংরক্ষিত হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে গুরুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মালতী অধ্যয়নরত মধুর প্রতি কাগজের পিণ্ড ছুঁড়ে মারছে।[২৬] চতুর্ভুজ দাসের কাব্যটি রাজস্থানী কাংগ্রা রীতিতে চিত্রিত।

রাজস্থান এলাকায় আরো অনেকগুলি চিত্রসম্বলিত মধুমালতীর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে একটি পাণ্ডুলিপির চিত্রায়ন ঘটে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে, কুলুর প্রীতম সিংহের রাজত্বকালে। কয়েকটি চিত্রে[২৭] কাহিনীটি এইরূপ আকার ধারণ করেছে ঃ চিত্রসেনের কন্যা মালতী প্রথম দর্শনে মধুর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। নায়ক প্রধান মন্ত্রীর পুত্র। তাদের গোপন প্রেমের প্রতি সক্রিয় সহানুভূতি জানায় মালতীর প্রিয় সহচরী জৈত-মাল। মধুকে বন্দী করার জন্য চিত্রসেন সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়ে দেন। নায়ক সেই পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাতে নায়িকা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কিন্তু বিপদের সঙ্গিনী জৈতমাল তাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে। যুদ্ধে

কিন্তু মধু ঐশ্বরিক সাহায্যে বলীয়ান। গরুড়ের হুকুমে এলো ব্যাঘ্র-যূথ ও অসংখ্য বিরাটকায় পাখী। তাদের আক্রমণে চিত্রসেনের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। শেষ পর্যন্ত তিনি পরিস্থিতিকে মেনে নিতে বাধ্য হন। একটি চিত্রে চান্দ ও রূপমালা প্রেমালাপরত। চান্দ ব্যাঘ্রের আক্রমণ প্রতিহত করে। এটি বোধ হয় প্রেমা-তারাচাঁদ উপগল্পের রূপান্তর। আর একটি চিত্রে সরোবর কিনারায় কলসী-কাঁখে কয়েকটি রমনী—পাশে মধু উপবিষ্ট। জলে পদ্ম শোভা পাচ্ছে, আকাশে উড়ছে একঝাঁক পাখী দুজন রমণী আনমনা হয়ে কলসী দুটিকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। এধরণের দৃশ্য আমরা চতুর্ভূজ দাসের মধু-মালতীর চিত্রেও লক্ষ্য করেছি। এগুলি দেখে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে পড়ে যায় যমুনাতীরে রাধাকৃষ্ণের সাক্ষাতের ঘটনা। চিত্রকর যে সে সম্বন্ধে সচেতন, তার প্রমাণ রয়েছে নায়কের শ্যাম বা নীল গাত্রবর্ণে। ঘন ঘন যুদ্ধ বিগ্রহের দৃশ্য দেখে মনে হয় যেন তদানীন্তন সামন্ত জীবনের শিভ্যালরীর রূপরেখা ফুটেছে এই চিত্রমালায়। এগুলি রাজস্থানী-পাহাড়ী পদ্ধতিতে অঙ্কিত। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কবি ও চিত্রশিল্পীদের হাতে পড়ে গল্পটির চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

## ছয়

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে মধুমালতীর প্রেম-কাহিনী উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে প্রসার লাভ করেছিলো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুফী মতবাদের প্রতীকরূপে আর কোথাও বা বিশুদ্ধ রোমান্‌স্‌ হিসাবে। সতোরো-আঠারো শতকের হিন্দু কবি ও চিত্রকরগণ এ গল্পের গায়ে সামান্য কিছু অলৌকিকতার রঙ লাগিয়েছেন—এটা তাঁদের পুরাণাশ্রিত কল্পনা-প্রবণতার পরিচয়। বিভিন্ন ভাষা ও ভৌগোলিক পরিবেশের সুদীর্ঘ ও বিচিত্র পরিক্রম-পথ পার হয়ে এই উপাখ্যান যখন বাংলা দেশে এলো, তখন সে আর সুফী মতবাদের বাহন রইল না, বরং নিছক মানবীয় রোমান্‌সের রূপ নিলো।

করমণ্ডল থেকে আরম্ভ করে আরাকান পর্যন্ত একটানা সমুদ্র তীরাঞ্চল। মধ্যযুগের বণিকগণ দাক্ষিণাত্যের শহর-বন্দর ছুঁয়ে পৌঁছে যেতো সাতগাঁ, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁ, পেগু প্রভৃতি বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিতে। পণ্য বিনিময়ের

সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্য ও বাংলা দেশের মাঝে হয়তো সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও হয়েছিলো। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই লেনদেনের কোনো সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বাংলার সঙ্গে দাকিনী সাহিত্যের যোগাযোগ প্রসঙ্গে জনৈক পণ্ডিত একটি তথ্য বহুল ও মূল্যবান প্রবন্ধে সম্প্রতি এ ধরণের ইঙ্গিত করেছেন যে, দৌলত-কাজীর 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী' এবং আলাউলের 'সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল'-এর সঙ্গে গোলকুণ্ডার কবি গাওয়াসী রচিত 'চানদা লোরক' ও 'সয়ফুল মুলক্ বদিউজ্জমাল' কাব্যের কোনো না কোনো যোগসূত্র আছে।[২৮] কিন্তু পূর্বোক্ত বাংলা কাব্য দুটিতে কবিদ্বয় একথা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, কাহিনী দুটি যথাক্রমে সাধনের হিন্দী 'মৈনা সত' ও ফারসী ভাষায় রচিত 'সয়ফুল মুল্ক্ বদিউজ্জমাল' থেকে অনুদিত।[২৯] আমাদের মনে হয়, সেকালে দাক্ষিণাত্য ও বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে একটা সমান্তরাল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো এবং তার মূলে ছিলো উভয় দেশের সাহিত্যিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন-বোধ এবং উত্তর ভারত ও ইরানের সঙ্গে উভয়ের যোগাযোগ। চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এ দুটি দেশের বৃহত্তর জীবনে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিলো। বাহমনী সুলতানদের আমলে যেমন দাকিনী উর্দু সাহিত্যের সূত্রপাত, ইলিয়াস শাহী শাসকদের রাজত্ব কাল ঠিক তেমনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সৃজ্যমান যুগ। সেকালের দাকিনী সাহিত্য তাসাউফ তত্ত্বে ও ইসলামিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত আর বাংলার কাব্য-সাহিত্য হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী-নির্ভর। ধর্মাশ্রয়ী ও দেবদেবীর মাহাত্ম্য-মূলক লৌকিক কাহিনীর স্তর অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্য ধর্মীয় সংস্কার-বর্জিত মানবীয় প্রণয়-কাহিনীর স্তরে এসে হাজির হয় ষোল শতকের প্রথম পাদে—একাধিক বিদ্যাসুন্দর কাব্য ঠিক এই সময়েই রচিত। সৃজন-নৈপুণ্যের দিক দিয়ে বাহমনী রাজ্য আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সেখানে পনেরো শতকের প্রথম ভাগেই পদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গদ্যেরও জন্ম এবং ঠিক একই সময়ে একখানি রোমান্টিক কাব্য রচিত হয়—কাব্যটির নাম 'কর্‌ম্‌ রাও ওয়া প্রেম'— রচয়িতা নিযামী বাহমনী সুলতান তৃতীয় আহ্‌মদ শাহের (১৪৬০—৬২ খৃঃ) সমসাময়িক।[৩০] মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে দাক্ষিণাত্য ও বাংলা দেশের সঙ্গে উত্তর ভারতের যোগাযোগ বেড়ে যায়। লোর-চানদা, পদুমাবত, মৃগাবত, মধুমালত, সয়ফুল মুল্‌ক

বদিউজ্জমাল প্রভৃতি গল্প এই দুই দেশের সাহিত্যে স্থান পায় সতেরো-আঠারো শতকে অর্থাৎ মোগল আমলে। এই রোমান্স্‌গুলি কল্পনাপ্রবণ মনের খোরাক যুগিয়েছে। এই উভয় দেশেই আবার শরা-শরিয়ত-বিষয়ক ও মুসলিম পুরাকাহিনী-মূলক কতকগুলি কাব্য লেখা হয়েছে ধর্মীয় প্রয়োজনের তাগিদে। এই প্রসঙ্গে সৈয়দ সুলতানের 'ওফাতে রসুল' ও 'শবে মেরাজ' এবং নসরুল্লাহ খানের 'শরিয়ত নামা' উল্লেখযোগ্য।[৩১] দাকিনী সাহিত্যেও এই ধরনের কয়েকটি কাব্যের সন্ধান মিলেছে। 'মি'রাজ নামা', 'ওয়াফাত নামা-এ পয়গম্বর' এবং 'শরীয়ত নামা' এ সাহিত্যের কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ কাহিনী-গ্রন্থ বা ধর্মগ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থটির মূল ফারসী, লেখক ও রচনাকাল অজানা। দ্বিতীয়টির রচয়িতা মীর— তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। 'শরিয়ত-নামা'র কবির নাম শাহ মালিক, রচনাকাল ১০৭৭ হিজরী বা ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ।[৩২] দুই দেশের সাহিত্যিক বিষয়বস্তুর এই আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য সত্ত্বেও একথা মনে করা বোধহয় নিরাপদ নয় যে এদের মধ্যে এক দেশ অপরের দ্বারা প্রভাবিত। দাক্ষিণাত্যের কাব্যগুলি এক্ষেত্রে আরবী-ফারসী থেকে অনূদিত। 'শবে মেরাজ', 'নবীবংশ' ও 'ওফাতে রসুল'-এর ভূমিকায় সৈয়দ সুলতান প্রায় স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে আরবী ও ফারসা ভাষায় লিখিত ধর্মীয় কাহিনীগুলি বাঙ্গালী মুসলমানদের পক্ষে সহজগম্য নয় বলে তাদের সুবিধার জন্যে তিনি সেগুলি বাংলায় ভাষান্তরিত করেছেন।[৩৩] দাকিনী ও বাংলা সাহিত্যের আর একটি শাখা হচ্ছে 'জঙ্গনামা'-জাতীয় মর্সিয়া কাব্য। দাক্ষিণাত্যে এই শ্রেণীর কাব্যের প্রেরণা যুগিয়েছে সে দেশের শিয়া মতবাদ ও ইরানের সাংস্কৃতিক প্রভাব। বাংলা দেশ সম্বন্ধেও মোটামুটিভাবে একই কথা বলা যায়। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহম্মদ হুসেইন কর্তৃক ১৬৪৫—৪৬ খৃষ্টাব্দে রচিত 'মকতুল হুসেইন' বাংলা ভাষার প্রথম মর্সিয়া কাব্য। তখন থেকে আরম্ভ করে প্রায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই ঐতিহ্যের ধারাটি প্রবহমান। এক্ষেত্রেও বোধহয় দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে এদেশের যোগাযোগের কোনো ইঙ্গিত নেই। আওরঙ্গজেবের রাজসভায় এ ধরনের অভিযোগ করা হয়েছিলো যে বাংলাদেশের শাসনকর্তা শুজা শিয়া বনে গিয়েছেন। এ অভিযোগ ভিত্তিহীন; কিন্তু তিনি যে ইরান থেকে আগত শিয়া পণ্ডিত ও শাসকগণকে যথেষ্ট সম্মান দেখাতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর কর্মচারীদের নাম-ধাম এইরূপ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তাঁরা শিয়া

মতাবলম্বী। বারহার সৈয়দগণ ছিলেন তাঁর একনিষ্ঠ সমর্থক ; তাঁরাও তো শিয়া।[৩৪] রাজশাহী দরগায় প্রাপ্ত সেকালের একটি শিলালিপিতে দেখা যাচ্ছে যে, আলী কুলি বেগ নামক একজন প্রবাসী শিয়া এই বাংলা দেশে বসেই ইছনা-আশারিয়া সম্প্রদায়ের ভরসা-স্থল, সাফাভী শাসক শাহ আব্বাসের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছেন, মোগল সম্রাট শাহজাহানের নামমাত্র উল্লেখ না করে।[৩৫] ডাচ পর্যটক গতিয়ের স্থাউটেন্ আওরঙ্গজেবের সমকালীন বাংলায় শিয়াদের মহরম মিছিল দেখে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এই পরিবেশে মার্সিয়া-সাহিত্য সৃষ্টি আদৌ বিচিত্র নয়।

মধুমালতীর কাহিনীও বাংলা দেশে এসেছে উত্তর ভারত থেকেই, দাক্ষিণাত্য থেকে নয়। বাংলা রোমান্সগুলির গুলশান-ই-এশকের সঙ্গে ততটা সাদৃশ্য নেই, যতটা আছে অবধী বা ফারসী মধুমালতীর সঙ্গে। যে কয়জন বাঙ্গালী কবি এই উপাখ্যান নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ কবীরই বোধ হয় প্রাচীনতম। তিনি অন্ততঃ দু'বার একথা বলেছেন যে, গল্পটি ফারসীতে ছিল এবং কাব্যের উপসংহারে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এর মূল রয়েছে হিন্দীতে।[৩৬] কিন্তু তাঁর কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বলে স্বভাবতই মনে হয় যে, এটি ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'কিস্‌সা-এ-মধুমালত ওয়া কুনওর মনোহর' নামক ফারসী কাব্যটির অনুবাদ। তাঁর কাব্য থেকে মনোহরের বাল্য-বৃত্তান্ত পড়ে এই ধারণা জন্মে যে উক্ত প্রসঙ্গ ফারসী কাব্যটির অংশ-বিশেষের একটি ভাষান্তরিত রূপ। আমরা উভয় কাব্য থেকে আবশ্যক অংশগুলি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি ঃ[৩৭]

ওলিগণে গুণিতে মাগিতে লাগিল।
ভালমন্দ কুমারের সকল গুণিল॥
রাশিক্রমে পুরাণেত দেখিয়া উপাম।
রাখিলেক মনোহর কুমারের নাম॥
... ... ... ...
ভাগ্যবন্ত তোহ্মা পুত্র চন্দ্রের সমান॥
... ... ... ...

حکیم وهم منجم گشت حاضر
شدند هریک برو خورشید خاطر
بدیدند طالع مسعود بودش
بر آمد اختر دولت زنورش
نهادند نام او کنور منوهر
شوداند رجهان از شمس اظهر
خبر دادند کارش راز انجام
چه از دولت چه از ملکت چه از نام

মাত্র কি হইব দুঃখ কুমার অন্তর।
এক চন্দ্র-মুখী লাগি হৈব দেশান্তর ॥
পঞ্চদশ বরিষেত এ সকল হৈব।
পুনরপি আসি কুমার রাজত্ব পালিব ॥

شود چون پانزده ساله منوهر
خلش شخصی بود در سینه اظهر
شود جوگی بهر جانب بگردد
که تا یک سال بهراو بگردد
چو بعد از سپهر آید سوی خانه
بدست آرد همان مطلب زمانه

আবার উভয় কাব্যে নৌকাডুবি-প্রসঙ্গ এমনিভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

হেন সমে ধর্মযোগে কৈলা উপাসন।
শীতলে শীতলে বাউ বহে ঘন ঘন।
... ... ... ...
নৌকা সব নিয়া এক ঘুর্ণিত ফেলিল ॥
সৈন্য সমে সেই ঘুর্ণি গরাসিল।
ভিন্ন ভিন্ন নানাস্থানে হইয়া ভাসিল ॥
.. .. ... ...
সমুদ্রেত রাইতে পারে প্রভু কৃপামএ।
অমূলে ডুবাতে পারে সে করতাএ ॥
ভাসতে ডুবিতে এক কাষ্ঠখণ্ড পাইল ॥
সেই কাষ্ঠে ভর করি কূল উদ্দেশিল ॥
জরজর পাঞ্জরা যে করিছে লহরে।
এক ঠাঁই কুল পাই প্রাণ-পাএ ধরে ॥

درین اثنا قضای آسمانی
مخالفت بادی شد ناگهانی

همه کشتی میان موج افتاد
همه لشکر دران گرداب افتاد
فرو رفتند در گرداب ان موج
منوهر هم بغلطان رفت در موج
خدا را یاد میکرد وهمی رفت
بجز نام خدا دیگر نمی گفت
که ناگه در میان موج آنجا
منوهر یافت چوبی محکم انجا
باخر چند مدت در کناره
رسیده بادل جان پاره پاره

এখানেও দেখা যাচ্ছে যে বাংলা কবিতাংশটি ফারসীর প্রায় অবিকল অনুবাদ। অবধী ও ফারসী কাব্যের প্রেমা, চিত্রসেন, চিৎ-বিস্‌রাম ও কন্‌কর মুহম্মদ কবীরের মধুমালতীতে যথাক্রমে পাএমা বা ফাতেমা, ছত্রসেন, জটবহর ও কঙ্গিরায় পরিণত হয়েছে। এই পাঠ-বিকৃতির প্রধান কারণ, এই নাম বা স্থান-বাচক শব্দগুলির ফারসী থেকে বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণ। তাছাড়া কাব্যটিতে অপ্সরার স্থানে পরীর উপস্থিতি এই ইঙ্গিত বহন করছে যে, এটি অবধী রোমান্‌সের অনুবাদ নয়, বরং ফারসী কাব্যের ভাষান্তরিত সংস্করণ। কাহিনীটির মৌলিক রূপ যে হিন্দী-ভাষায়

বিধৃত, সে সম্বন্ধে ফারসী কবিগণ স্পষ্টভাষী। তাঁদেরই অনুসরণে মুহম্মদ কবীর তাঁর কাব্যের শেষ দিকে গল্পটির হিন্দী উৎসের নির্দেশ দিয়েছেন বলে মনে হয়। কাব্যের প্রথম দিকে তিনি স্পষ্টভাবেই অবলম্বিত ফারসী কাব্যের ঋণ স্বীকার করেছেন অন্ততঃ দুবার। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' কাব্যের রচনাকাল সতেরো শতকের শেষার্ধ অথবা আঠারো শতকের প্রথম ভাগ। পূর্বোক্ত 'কিস্‌সা-এ-মধুমালত ওয়া কুন্‌ওর মনোহর' কাব্য তাঁর অবলম্বন হলে বাংলা কাব্যটিকে কিছুতেই সতেরো শতকের প্রথমার্ধে টেনে আনা যায় না—ষোল শতকের তো প্রশ্নই উঠেনা;[৩৮] কেননা উক্ত ফারসী সংস্করণ প্রস্তুত হয়েছিলো ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে।

আঠারো-উনিশ শতকের বাংলা দেশে মধুমালতী কাহিনীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। উত্তর-বঙ্গের কবি সাকের মাহমুদ ১৭৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে একটি 'মধুমালা-মনোহর' কাব্য প্রণয়ন করেন। বাইশ বছর বয়সে কবি যখন কাব্য রচনায় রত, তখন তিনি ফারসী ও বাংলা ভাষা জানতেন।[৩৯] এতে করে মনে হয় যে তাঁর লেখাটি কোনো ফারসী কব্যেরই অনুসরণ।

আঠারো শতকের শেষভাগে রচিত সৈয়দ হামজার[৪০] 'কেচ্ছা মধুমালতী' ভাষা-গত বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন দোভাষী পুথি সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি। তাঁর মধুমালতী কাব্যে বিশুদ্ধ ভাষা-রীতি অনুসরণ সেইজন্য অত্যন্ত আকস্মিক ও বিস্ময়কর! তবে এটা কি অবধী হিন্দী কবি মন্‌ঝনের প্রভাব? উভয় কাব্যে কাহিনীর কাঠামো প্রায় একই রকম এবং স্থান ও পাত্র-পাত্রীর নামেও সাদৃশ্য একেবারে কম নয়। কিন্তু আরো কতগুলি জোরালো যুক্তি আছে। সেগুলি ভিন্ন মতবাদের অনুকূল। সৈয়দ হামজা যদি সত্য সত্যই মীর মন্‌ঝনের ধার ধারতেন, তাহলে তিনি হয়তো অবিমিশ্র বাংলায় লিখিত এই কাব্যে পরীর আমদানী না করে অবধী কবির অনুকরণে অপ্সরাকেই প্রাধান্য দিতেন। এই আখ্যায়িকায় পরীর উপস্থিতি ফারসী প্রভাবের ইঙ্গিতবহ। ফারসী ঘেঁষা 'কেচ্ছা মধুমালতী' নামটিও বোধহয় বটতলার প্রকাশকদের কারসাজি নয়, কেননা 'হাতেম তাই' পুথিতে আলোচ্য কাব্যটিকে কবি নিজে ঐ নামেই অভিহিত করেছেন। তাছাড়া তাঁর কাব্যে 'কিঙ্কর নগর' শব্দটির মধ্যেও ফারসী কাব্যে উল্লিখিত 'শহর কন্‌কর'-এর প্রতিধ্বনি রয়েছে। গৃহে

প্রত্যাবর্তনের পর মাতাপিতার সঙ্গে মনোহরের সাক্ষাৎ উভয় কাব্যে বর্ণিত। নীচের উদ্ধৃতিতে [৪১] দেখা যাবে যে এই বর্ণনাও সাদৃশ্য বহুল ঃ

সৈয়দ হামজার 'কেচ্ছা মধুমালতী'

সবে গিয়া উত্তরিল ... ... ...
যেখানে আছিল মনোহর ॥
কুমার মা বাপে দেখি ছল ছল দুটি আখি
কান্দিয়া পড়িল পদতলে।
আহা মরি মরি বলে মনোহরে কোলে তুলে
সুর্জ্জভান কান্দে কৌতুহলে ।
রাজারে প্রণাম করি মনোহর তরাতরি
ধরে গিয়া মায়ের চরণ।

অজ্ঞাতনামা ফারসী কবির 'কেস্‌সা-এ-মধুমালত ওয়া কুনওর মনোহর'

منور هم باستقبال رفته
قدم بوسی پدر مادر گرفته
پدر مادر بدستش برگرفتند
بصد مهرش کناره درگرفتند

আরো কয়েকজন বাঙ্গালী কবি এই আখ্যায়িকা নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁদের নাম চুহর, গোপীনাথ দাস, নূর মুহম্মদ ও জোবেদ আলী—এঁরা উনিশ-বিশ শতকের লোক।[৪২] কালক্রমে এই জনপ্রিয় গল্প লোক-গীতিকার রূপ নিয়েছিলো—যার একাধিক সংস্করণ পাওয়া যাচ্ছে পূর্ব বাংলায়।[৪৩] জসিমউদ্দীনের লিরিক্যাল নাটক 'মদনকুমার-মধুমালা' এই লোক-গীতিরই রূপান্তর। নজরুল ইসলাম বোধহয় তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুর জন্য কোনো পুথিকারের নিকট ঋণী।

অবধের এক অতি প্রাচীন লোক-কাহিনী এমনিভাবে অবধী, ফারসী, হিন্দী, দাকিনী ও বাংলা সাহিত্য জগৎ পরিভ্রমণ করে অবশেষে এদেশের লৌকিক গল্প-গীতির আসরে স্থান পেয়েছে।*

---

* এই প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজী সংস্করণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আলোচনা সভায় ২৯.৪.৬২ তারিখে পঠিত ও আলোচিত। এটির রচনায় উৎসাহ ও সাহায্য যুগিয়েছেন লেখকের বন্ধু, অধ্যাপক কবি হানিফ ফড়ুক।

## তথ্য-নির্দেশ

১। মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত': গ্রীয়ারসন ও সুধাকর দ্বিবেদী-সম্পাদিত Bibliotheca Indica সংস্করণ, পৃ ৫১২। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬, বৈশাখ—শ্রাবণ, পৃ ২৭। নায়ক-নায়িকার নামের পাঠ-সংক্রান্ত মতামতের জন্য দ্রষ্টব্য: A. G. Shirreff: Eng. Trans. of *Padmavat*, Bibliotheca Indica, 1947, পৃ ১৪৪, পাদটীকা। উপরোক্ত সংস্করণে মধুমালতী প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে এমনিভাবে: সাধ কুঅঁর গংধাবতী জোগূ।

মধুমালতী কহঁ কীহ্ন বিওগূ।।

কিন্তু এ ব্যাপারে বিহার শরীফ পাণ্ডুলিপির পাঠ সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। প্রথম চরণটি সেখানে:

সাধ কুনওর মনোহর জগূ।

রামচন্দ্র শুক্ল, সুধাকর দ্বিবেদী ও মানের পাণ্ডুলিপি প্রদত্ত 'খণ্ডাবত' বা 'গংধাবত' শব্দটির জায়গায় 'মনোহর' শব্দটি স্বাভাবিক কারণেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। দ্রষ্টব্য S. H. Askari: *The Bihar Sharif Manuscript of Padmavat*, Patna University Journal, Off Print, p 6. অধ্যাপক হাসান আসকারীর সৌজন্যে আমি 'পদুমাবতে'র মানের পাণ্ডুলিপির একটি ফটোস্ট্যাট কপি পাটনা থেকে সংগ্রহ করে বাংলা একাডেমীকে দিয়েছি—এটির লিপিকাল ৯১১ হিজরী বলে উল্লেখিত।

২। মনঝনের মধুমালতী-কাহিনীর জন্য দ্রষ্টব্য: রামচন্দ্র শুক্ল: হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, নাগরী প্রচারিণী সভা, ১৯৯০ সম্বৎ, পৃ ৯৬-৯৯। এই গ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠায় মনঝনের সময় ১৫৫০-৯৫ সম্বৎ বা ১৪৯৩-১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর 'মধুমালত' কাব্যের একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আছে বারানসীর ভারত কলা পরিষদে। এর ভিত্তিতে মন্‌ঝন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে নাগরী প্রচারিণী পত্রিকায় (নতুন সিরিজ, ষষ্ঠ খণ্ড, সংখ্যা তিন),

রূপম, নং ৩৩-৩৪, পৃ ৯। মনঝন ও মুসরতীর জন্য দ্রষ্টব্য : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যে উর্দু-হিন্দী প্রভাব : মাহে নও, পৌষ, ১৩৬৭।

৩। A. G Shirreff : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৪৪, পাদটীকা।

৪। অধ্যাপক হাসান আসকারী প্রদত্ত 'মৃগাবত' কাব্যের উদ্ধৃতি : *Qutban's Mrigavat, A Unique Ms. in Persian Script*, Journal of The Orissa Research Society, XLI, 455.

৫। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬, বৈশাখ—শ্রাবণ, পৃ ২৪।

৬। মন্‌ঝনের 'মধুমালত' থেকে সুফী প্রভাব নির্দেশক এই উদ্ধৃতি দুটির জন্য দ্রষ্টব্য রামচন্দ্র শুক্লের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১০০।

৭ E. G. Browne : *A Literary History of Persia*, Vol. I, London, 1925, 439 ও 442 পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য। *A History of Persian Literature Under Tartar Dominion*, Vol. III, Cambridge, 1920, p. 531.

৮। নাসিরউদ্দিন হাশমী : ইউরোপ মেঁ দাখ্‌নী মাখ্‌তুতাত্‌, হায়দরাবাদ, ১৯৩২, পৃ ১১৯।

৯। *Catalogue of the Persian Mss. in the Buhar Library*, Vol. I, Calcutta, 1921, no. 395, pp 288-89.

১০। Charles Rieu : *Catalogue of the Persian Mss. in the British Museum*, Vol II, London, 1881, p 803b. নাসিরউদ্দিন হাশমী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৭৩।

১১। Rieu : পূর্বোক্ত, 699a; H. Ethe : *Catalogue of Persian Mss. in the Library of India Office*, Vol. I, Oxford, 1903, no. 1634/2, pp 893-94. নাসিরউদ্দীন হাশমী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৭৪।

১২। Rieu এর উপরোক্ত ক্যাটালগ, 700a.

১৩। নাসির আলী লিখেছেন : ( Rieu, ঐ )

هزاران را آفرین بر شیخ جمن
بشعر هندوی بوده است پرفن

আর 'কিস্‌সা-এ-মধুমালত ওয়া কুনওর মনোহর' কাব্যে পাচ্ছি (হাশমী, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭১ পাদটীকা ২):

چناں اندیشہ برمن گشت روشن
کہ مدھ مالت زبان ھندی زمنجھن
بگویم فارسی در شعر ابیات
دروغ دراست او داند زابیات
ھزاراں آفریں بر شیخ منجھن
ز شعر ھندوی بوداست پر فن

১৪। Ethe': পূর্বোক্ত ক্যাটালগ্‌, no. 824 p 534. নাসিরউদ্দীন হাশমী: পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ২৭৪। বড্‌লিয়ান গ্রন্থাগারেও একটি পাণ্ডুলিপি আছে। Ethe': *Catalogue of Persian Mss. in Bodleian Library*, Oxford. 1889, no. 478, p. 439.

১৫। Ethe': ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পাণ্ডুলিপির পূর্বোক্ত ক্যাটালগ্‌, no. 803/3, p. 529.

১৬। নাসিরউদ্দীন হাশমী প্রচুর ফারসী উদ্ধৃতিসহ গল্পটির সারমর্ম দিয়েছেন। আমাদের এই গল্পাংশ ফারসী উদ্ধৃতিগুলিকে ভিত্তি করে লিখিত। তুলনীয়: ইউরোপ মেঁ দাখনী মাখ্‌তুতাত, পৃ ২৭৭ ও ২৭৯-৮৫। তিনি প্রেমা-তারাচাঁদের কাহিনী বাদ দিয়েছেন—কিন্তু দুই রাজকুমারের স্বদেশ প্রত্যা-বর্তনের উল্লেখ থেকেই এই উপগল্পের অস্তিত্ব আঁচ করা যায়।

১৭। 'মিহর ওয়া মাহ্‌'-এর এই সংক্ষিপ্ত গল্পও নাসিরউদ্দীন হাশমী-প্রদত্ত উদ্ধৃতি অবলম্বন করে দেওয়া গেল। তাঁর গ্রন্থের ২৭৫-৭৬ এবং ২৭৯-৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৮। নাসিরউদ্দীন হাশমী: দাকিন মেঁ উর্দু, লাহোর, ১৯৫২, পৃ ২৫-৩২ ও ৩৭-৩৯।

১৯। গাওয়াসীর চানদা-লোরকের জন্য দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ ৭৮; উদ্ধৃতির জন্য পৃ ৮৬-৮৭। এগুলির সঙ্গে তুলনীয় 'ইউরোপ মে দাখনী মাখ্‌তুতাত' গ্রন্থের

—১৭

৫৬৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 'কেস সা-এ-মৈনা' কাব্যের উদ্ধৃতি। গল্পাংশের জন্য দ্রষ্টব্য পৃ ৫৬৮। কাহিনী যে ফারসী থেকে গৃহীত, তার প্রমাণ আছে এই দুটি চরণে :

> রিসালা উঠা ফারসী সোঁ আউয়াল।
> কেয়া নযম্ দখ্‌নে সতে বে বদল্ ॥

কেস্ সা-এ-মৈনার এই বিবরণ ইণ্ডিয়া অফিস পাণ্ডুলিপি-ভিত্তিক। হায়দরাবাদের সালার জঙ্গ মিউজিয়মে মৈনার সতীত্ব বিষয়ক দাকিনী কাব্যের যে পাণ্ডুলিপিটি রক্ষিত হয়েছে, তাতেও এই দুটি চরণ পাওয়া যাচ্ছে। কাহিনীর চেহারাও উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন। দ্রষ্টব্য মুআছের, ১৬শ খণ্ড, পৃ ৮৩-৮৪। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৭, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, পৃ ৩৯।

২০। নাসিরউদ্দীন হাশমী : ইউরোপ মেঁ দাখ্‌নী মাখ্‌তুতাত্, পৃ ১২০ ও ১৩৫।

২১। ঐ, পৃ ১৪৯ ও ৪৫৫-৬৬।

২২। নুসরতীর এই কাব্য ডাঃ আবদুল হকের সম্পাদনায় আঞ্জুমন-ই-তরক্কী উর্দু, করাচী থেকে প্রকাশিত। কাহিনীর হিন্দী ও ফারসী উৎসের উল্লেখ আছে— এই সংস্করণের ২২১ পৃষ্ঠায়। আরো দ্রষ্টব্য : হাশমীর ইউরোপ মেঁ দাখ্‌নী মাখ্‌তুতাত্, পৃ ২৭৭-৭৮।

২৩। যেমন দাকিনী কাব্যে : رکھیا ناﺆں اس کا سو منہر کنور

এবং ফারসী কাব্যে : نہا دند نام او کنور منوھر

২৪। Pandit Keshava Prasad Misra : *An Illustrated Manuscript of Madhu-Malati*, Rupam, 1928, January-April, Nos. 33-34, pp 9-10.

২৫। শ্রী উদয়শঙ্কর শাস্ত্রী : চতুর্ভুজ দাস কি মধুমালতী মে মৈনাসত প্রসংগ্, ভারতীয় সাহিত্য, জুলাই, ১৯৫৯, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ ৯৯-১৩৬।

২৬। পণ্ডিত কেশবপ্রসাদ মিশ্রের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ ১০-১১। সংশ্লিষ্ট চিত্রগুলি দ্রষ্টব্য।

২৭। Jagadish Mittal: *An Illustrated Manuscript of Madhu-malati And other Paintings from Kulu*, Lalit Kala, nos. 3-4, April, 1956 —March. 1957, Lalitkala Akadami, New Delhi, pp. 90—94. চিত্রগুলির জন্য দ্রষ্টব্য Pls. XLIII, XLIV এবং E. রূপম পত্রিকায় প্রকাশিত, পূর্বোক্ত চিত্রগুলির সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় অঙ্কন-পদ্ধতিতে এবং মানব-মানবীর পোষাক-পরিচ্ছদে ও মুখাবয়ব-চিত্রণে।

২৮। ডক্টর এ বি, এম, হবিবুল্লাহ: বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান: গুলে-বকাওলী, সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ ১০-১১।

২৯। সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল-সম্পাদিত দৌলত কাজীর 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী,' সাহিত্য প্রকাশিকা, বিশ্বভারতী, ১৩৬২, পৃ ৪৯; বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬, বৈশাখ-শ্রাবণ, পৃ ১৫ এবং ১৩৬৭, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, পৃ ৩৮। ডক্টর সুকুমার সেন: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ১৯৪৮, পৃ ৫৮৫।

৩০। হাশমী: দাকিন মে উরদু, পৃ ৩৩—৩৭।

৩১। এই কাব্যগুলির পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য ডক্টর এনামুল হক: মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৫৭, পৃ ১৫৩-৫৪, ১৫৫-৫৭ এবং ১৭৭-৭৮। 'ওফাতে রসুল' আলী আহমদের সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে ১৩৬৫ সালে প্রকাশিত।

৩২। হাশমী: ইউরোপ মেঁ দাখ্‌নী মাখতুতাত, পৃ ৩১৪-১৭ ৫৯৩-৯৪ এবং ৬২২-২৩।

৩৩। পূর্বোক্ত ওফাতে রসুলের ভূমিকায় (পৃ ৸৵০) আলী আহমদ কর্তৃক উদ্ধৃত 'শবে মেরাজ'; ঐ, পৃ ৭-৮। এনামুল হক: পূর্বোক্ত গ্রন্থের ১৪৪ ও ১৫০ পৃষ্ঠায় 'শবে মেরাজ' ও 'নবীবংশের' উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

৩৪। *History of Bengal*, D. U., 1948, p 335.

৩৫। শিলালিপিটির তারিখ ১০৪৫ হিজরী বা ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ। দ্রষ্টব্য Varendra Research Society's Monograph, 1949, pp 48—49. আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Journal of the Asiatic Society of Pakistan vol. VI, 281—82.

৩৬। আহমদ শরীফ সম্পাদিত মুহম্মদ কবীরের মধুমালতী, বাঙলা একাডেমী, ১৩৬৬, ভূমিকা (পৃ ঘ), পৃ ৪, ৩০ ও ৫১।

৩৭। বাংলা কবিতাংশ দুটির জন্য দ্রষ্টব্য ঐ, ২—৩ এবং ২১—২২; ফারসী উদ্ধৃতি দুটির জন্য হাশমী: ইউরোপ মেঁ দাখ্‌নী মাখ্‌তুতাত, ২৭৯—৮০ এবং ২৮৩।

৩৮। আহমদ শরীফের ধারণা যে এটি ষোল শতকের রচনা। তিনি ডক্টর এনামুল হক-প্রদত্ত তারিখে অসঙ্গতি দেখিয়েছেন; এর নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে শেষ কথা বলেন নি। মধুমালতীর ভূমিকা, পৃ ছ। উক্ত তারিখ দুটি (১৫৮৮ অথবা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ) সম্বন্ধে ডক্টর হক নিজেও সন্দেহ-মুক্ত নন—সে কথা তিনি স্বীকার করেছেন। হেঁয়ালীতে উল্লিখিত তারিখটি আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদও বুঝতে পারেন নি। ডক্টর এনামুল হক: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৯৮। ডক্‌টর সুকুমার সেন ধরে নিয়েছেন যে মুহম্মদ কবীরের মধুমালতী আঠারো শতকের প্রথম দিকে রচিত। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৮৬১—৬২।

৩৯। ঐ, পৃ ৯২৭—২৮।

৪০। রিয়াজউদ্দীন কর্তৃক ১৩০১ সালে রিয়াজিয়া প্রেস, কোলকাতা থেকে মুদ্রিত; অধ্যাপক আহমদ শরীফের সৌজন্যে আমরা এই কাব্য ব্যবহার করেছি।

৪১। ঐ, পৃ ৮২। ফারসী উদ্ধৃতির জন্য হাশমী: ইউরোপ মে দাখ্‌নী মাখ্‌তুতাত, পৃ ২৮৫।

৪২। আহমদ শরীফ-লিখিত মুহম্মদ কবীরের মধুমালতী কাব্যের ভূমিকা, ঝ—ট।

৪৩। ডক্‌টর সুকুমার সেন: ইসলামি বাংলা সাহিত্য, বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৫৮; পৃ ১৭০—৭২। মুহম্মদ আশরাফ হোসেন: আমাদের পল্লী সাহিত্য, মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৪৩ ভাদ্র, পৃ ৭৫৬।